

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অস্ত্রের বনাবনানি (الْكِفَاحُ الدَّامِي)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

যুদ্ধের অনুমতি (الْإِذَانُ بِالْفِتَالِ):

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্রোহপরায়ণতা ও এক গুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা যে আয়াত নাযিল করলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(الْحَج: 39) [أُنْزِلَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ]

“ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।’ (আল-হাজ্জ ২২ : ৩৯)

তারপর এ ধরনের আরো বহু আয়াত অবতীর্ণ হয় সেগুলোতে বলে দেয়া হয় যে, যুদ্ধের এ অনুমতি যুদ্ধ হিসেবে নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিলের বিলোপ সাধন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করণ। যেমনটি ইরশাদ হয়েছেঃ (الْحَج: 41) [الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ]

“(এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।’ (আল-হাজ্জ ২২ : ৪১)

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হলও তা শুধু কুরাইশদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অনুমতির বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তা ওয়াজিবের স্তর বা পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন এ নির্দেশ কুরাইশ ব্যতীত অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। এ সব ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে এসব স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি :

১. মক্কার কুরাইশ মুশরিকদেরকে যুদ্ধরত গণ্য করা। কেননা তারাই প্রথম শত্রুতা আরম্ভ করে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর সাথে সাথে মক্কার অন্যান্য মুশরিক ব্যতীত কেবল তাদের ধন-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করাও জরুরি হয়ে পড়ে।

২. ওদের সাথে যুদ্ধ করা যারা আরবের সকল মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত ও একত্রিত হয়। অনুরূপ কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য গোষ্ঠী যারা পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

৩. সে সব ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করা যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খিয়ানত

করেছে এবং মুশরিকদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

৪. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা (যেমন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) যতক্ষণ তারা বিনীত হয়ে যিজিয়া কর না দেয়।

৫. মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা। ইসলামের হদ ব্যতীত তাকে কিছু করা যাবে না। তার বাকী হিসাব আল্লাহর হাতে।

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হল, কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হল ওটা যেহেতু শুধু কুরাইশদেরই শক্তিমত্তা ও একগুঁয়েমির ফল ছিল সেহেতু এটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কাজ যে মুসলিমগণ নিজেদের দখল সীমা কুরাইশদের ঐ বাণিজ্য পথ পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে যা মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। এ কারণেই দখল সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা দুটি হচ্ছে যথাক্রমে :

১. যে সকল গোত্র এ রাজপথের আশপাশে কিংবা এ রাজপথ হতে মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।

২. এ রাজপথের উপর টহলদারী দল প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ঐ ঘটনাটি যা পূর্বে ইহুদীদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল এবং যে চুক্তিটির বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। সামরিক তৎপরতা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মদীনা থেকে তিন মনজিলের অধিক অর্থাৎ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের ব্যবধানে তাদের আবাসস্থল অবস্থিত ছিল। টহলদারী সৈন্যদের পরিভ্রমণ কালে লোকজনদের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন যার আলোচনা পরে আসছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।